# কালীঘাটের পট

অঞ্জন সেন*

প্রাক্-কথন

কালীঘাটের পট যুগ সন্ধিক্ষণের চিত্রকলা, একদিকে মধ্যযুগের বাংলার চিত্রকলা শেষ পর্যায়ে আসছে, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক যুগের শুরু হচ্ছে শিল্পকলায়, পশ্চিমের প্রভাব কিছুদিন পর থেকেই প্রচলিত হয়ে যাবে। যে বঙ্গীয় শিল্পধারা শেষ পর্যায়ে তাতে কী ধরনের ছবি আঁকা হোত সেদিকটা আমরা একটু দেখে নিতে পারি —

(১) চিত্রিত পুথি ও চিত্রিত পুথির পাটা। বাংলায় আগাগোড়া চিত্রিত পুথি চৈতন্যোত্তরকালে খুব কমই পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আমরা উল্লেখ করতে পারি ভাগবত মহাপুরাণ (১৬৮৯-১৬৯০) এর চিত্রিত পুথি, রামচরিত মানসের চিত্রিত পুথি (১৭৭২-১৭৭৫), চুঁচুড়ার মণ্ডল পরিবারের গীতগোবিন্দ চিত্রিত পুথি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংরক্ষিত আরেকটি গীতগোবিন্দের চিত্রিত পুথি, ঢাকার পদ্মপুরাণের পুথি (১৮০৫)। এ ছাড়া কয়েকশত চিত্রিত পাটা বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। বাংলা গ্রন্থ চিত্রণের প্রথম যুগের কয়েকটি বইতে এই পুথিচিত্রের শৈলীতেই চিত্রণ দেখা যায়। সুলতান নবাবদের দরবারে মুঘল-পারসিক শৈলীর চিত্রিত পুথিও দেখা গেছে।

(২) পটুয়াদের দীঘল পট বা লাটাই পট যা লোকশিল্পের পর্যায়ে পড়ে, দীর্ঘদিন প্রচলিত।

(৩) পুজোর জন্য অঙ্কিত চৌকা পট — বিষ্ণুপুরের ফৌজদার শিল্পীরা এ জন্য বিখ্যাত, শান্তিপুরের কুমোর শিল্পীদের পটেশ্বরী কালী — এখনও আঁকেন সুবীর পাল, কৃষ্ণনগরের কুমোর শিল্পীদের নানান চিত্রকলা পটে আঁকা। এ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে পট চিত্র অঙ্কিত হোত, এখনও হয়। এগুলি কোনোটাই লোকশিল্পী জাত পটুয়াদের নয়।

(৪) সাদা কালো রঙের এক ধরনের চৌকাপট আঁকা হোত বর্ধমানের পূর্বস্থলীর কাছে মোরগ্রামে, এটিও সূত্রধরদের ব্যতিক্রমী শিল্পকর্ম।

(৫) মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুরে বড় আকারের ছবি আঁকা হোত কাগজের উপর, আঠারো শতকের এরকম কিছু চিত্রকলা বিভিন্ন সংগ্রহশালায় আছে।

(৬) রথচিত্র — রথের গায়ে উৎকৃষ্ট সব পৌরাণিক ছবি আঁকা হোত।

---

* কবি, শিল্প-গবেষক ও শিল্পকলা বিষয়ে বিশিষ্ট গ্রন্থকার

(৭) সরার ওপর দেবদেবী আঁকা হোত, আবার আঠারো শতকে হালিশহর থেকে ভোনা পটুয়া অঙ্কিত রামপ্রসাদের চিত্র পাওয়া গেছে যা প্রথমে সরায় আঁকা হয়েছিল।

(৮) মন্দিরগাত্রচিত্র — বহড়ু (২৪ পরগণা), গুপ্তিপাড়া (হুগলী), বাঁকুড়ার কোতলপুরের কাছে একটি গ্রামে।

(৯) এ ছাড়া পশ্চিমা রীতিতে তেল রঙ চলে এসেছে কোম্পানি স্কুলের ছবিতে। বিলিতী জল রঙেও ছবি আঁকা হচ্ছে।

(১০) প্রতিমার চালচিত্র।

**পট-কথা**

কালীঘাটের পট কালীঘাটের স্থানীয় শিল্পীদের মৌলিক সৃষ্টি — যে সৃষ্টির জন্য বাঙালি গর্ব করতে পারে। অনেক দিন থেকেই কালীঘাট মন্দিরকে কেন্দ্র করে কালীঘাটে একটা জনবসতি ছিল, তাদের মধ্যে শিল্পীসমাজও ছিলেন যাঁরা পুতুল ও প্রতিমা নির্মাণ করতেন, সরা ও চালচিত্রে ছবি আঁকতেন।[১] মন্দির থেকে ফেরার পথে তীর্থযাত্রীরা স্মারক হিসেবে পুতুল বা সরা, দেবদেবীদের মূর্তি যাতে আঁকা থাকতো, কিনে বাড়ি ফিরতেন। ক্রমে আরো বেশি তীর্থযাত্রী সমাগমে শুধু সরা বা পুতুলে তাঁদের চাহিদা মেটানো যাচ্ছিলো না, এই শিল্পীসমাজ দেশীয় কাগজে দেশীয় রঙ, হাতে তৈরি করা তুলি ও আলতাটুলির সাহায্যে দ্রুতগতির রেখাসম্পন্ন রেখাচিত্র আঁকতে শুরু করলেন, সরার থেকেও অনেক কম সময়ে অনেক বেশি পরিমাণে এই ছবি আঁকা যেতো। কোনো কোনো মতে আঠারো শতকের শেষ দশকে বা উনিশ সতকের গোড়ায় এই কালীঘাটের রেখাচিত্র বা পট আঁকা শুরু হয়েছিল। পরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিল্পী সম্প্রদায় কালীঘাটে এসে বসবাস শুরু করেন।

আজকাল অনেকেই লেখেন গ্রাম থেকে জাত পটুয়া যাঁরা এখনও দীঘল পট বা লাটাই পট এঁকে লোকসাধারণকে দেখিয়ে গান করে থাকেন তাঁরা কালীঘাট মন্দিরের জনসমাগম বৃদ্ধি দেখে কালীঘাটে আশ্রয় নিলেন ও রাতারাতি তাঁদের লৌকিক শৈলী ছেড়ে দ্রুত গতির রেখা, বর্তুল ডৌল অবয়ব আঁকতে শুরু করলেন। এ মতটি কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় — কালীঘাটের পট লোকশিল্প নয় — সম্মত শিল্প আর জাত পটুয়াদের আঁকার ধরনের সঙ্গে মিল নেই। যামিনী রায় যিনি বাংলার লোকশিল্প, পটুয়া শিল্প ও মন্দির টেরাকোটা মূর্তি নির্মাণের মার্গ শিল্পের দুটি ধারার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁর মতে "কলকাতা শহর যখন সবে গড়ে উঠছে তখন গ্রামের একদল লোক কালীঘাটে এসে বাসা বাঁধল এবং ছবি এঁকে চলল। এরা যদিও গ্রামের শিল্পী, সেখানে গড়ত প্রতিমা। কিন্তু নগর সভ্যতার সংস্পর্শে কিছুটা পরিবর্তন তাদের মধ্যে আসতে বাধ্য হলো। কারণ এরা আঁকতে শুরু করল শহরের চাহিদা মেটাতে — শহর বা আশেপাশে যে মেলা বসত, সেখানেই তারা ছবি বিক্রি করত। এইভাবে নগর জীবনকে অবলম্বন করে আঁকার দরুণ সে জীবনের ছাপ

এতে এসে পড়ল।" যামিনী রায়ের ব্যাখ্যা, "পটুয়া শিল্প বলতে দেশে কয়েকটা কুসংস্কার আছে। অনেকে মনে করেন পটুয়া ছবি আর কালীঘাটের ছবি দুটি শব্দই একার্থবাচক। প্রথম নয় যে এ কথার পেছনে কিছুমাত্র সত্য নেই; যদিও সত্য যা আছে তা নেহাতই অল্প। ..... বিদেশের সমালোচকেরা ছবি সংগ্রহ করেছেন মূলত কালীঘাট থেকে। নানান কারণে এর বেশী তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই, তাঁরা যে কালীঘাটের ছবির সঙ্গে পটের (জাত পটুয়াদের পট-লেখক) ছবিকে অভিন্ন মনে করবেন তাতে বিস্ময়ের অবকাশ অল্প। কিন্তু দুঃখের কথা, দেশের সমালোচকও প্রায়ই বিদেশীদের ভ্রান্তির প্রতিধ্বনি তোলেন।" [যামিনী রায়, ১৪১৫ : ২৭][২]

আসলে প্রাক্-ঔপনিবেশিক বঙ্গীয় শিল্পধারার সঙ্গে অপরিচয়ের কারণে এইসব দেশী বা বিদেশী সমালোচকদের পক্ষে ঠিক মত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। চৌকাপট যে আঙ্গিকটি কালীঘাটের শিল্পীরা ব্যবহার করতেন তার প্রচলন পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি জায়গায় ছিল। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা দেবদেবীর ছবি আঁকতেন যার নমুনা আশুতোষ মিউজিয়াম, স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়ামে আছে, বর্ধমানের পূর্বস্থলীর কাছে মোরগ্রামের সূত্রধর শিল্পীরা কাগজের ওপর সাদাকালোর বিচিত্র চৌকোপট আঁকতেন। শান্তিপুরের কুম্ভকার শিল্পীরা পটেশ্বরী কালীমূর্তি আঁকতেন, এখনও আঁকেন। কালীঘাট চিত্রশৈলীর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় গুপ্তিপাড়ার (হুগলী জেলা) বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের ও বহড়ুর (২৪ পরগণা) শ্যামসুন্দর মন্দিরের ভিত্তিচিত্রে — এ দুটি উনিশ শতকের প্রথমদিকের। বিষ্ণুপুরের ফৌজদার (সূত্রধর) শিল্পীরা পূজার জন্য দুর্গাপট আঁকতেন, রথের গায়ে দারুণ সব ছবি আঁকা হোত — এঁরা কেউই জাত পটুয়া সম্প্রদায়ের নয়। পুথি পাটার চিত্রে অবশ্য উপরিউক্ত শিল্পী সম্প্রদায় ছাড়াও মাঝে মাঝে পটুয়াদের শৈলী দেখা গেছে। বিষ্ণুপুরী দুর্গার মতো দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া যখনই কাগজে আঁকা চৌকাপটে দেব দেবীর ছবি দেখা গেছে তার মুখ সামনের দিকে Frontal বা Portrait। কালীঘাটের প্রথম দিকের দেবদেবী বা পৌরাণিক ছবিগুলো এরকম Frontal বা Portrait। মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রকলায় বা বাংলা পুথিচিত্রগুলিতে মুখগুলি তিন-চতুর্থাংশ পাশ ফেরানো Profile। কিন্তু মন্দির টেরাকোটায় বা দেবদেবীর দারু-মৃৎ-প্রস্তর শিল্পে এগুলি মূলত Frontal। বাংলার দেবদেবীর প্রতিমাও অনেকক্ষেত্রেই তাই। তাই প্রতিমামূর্তি-শিল্পের সঙ্গে প্রথম দিকের কালীঘাটের ছবির সাদৃশ্য রয়েছে আর রয়েছে সেই মূর্তিসুলভ ডৌলতা।

কালীঘাট চিত্রে দ্রুতগতির অপেক্ষাকৃত মোটা রেখাও দেশ বিদেশের শিল্পরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরসীকুমার সরস্বতী, অজিত ঘোষ, দেবপ্রসাদ সরকারের মতো বিশিষ্ট শিল্প-ঐতিহাসিকরা পালযুগের চিত্রকলার গতিময় রেখার বহমান ঐতিহ্যে কালীঘাটের রেখার অবস্থান দেখিয়েছেন। আর্চার সাহেব ও তাঁর অনুকারকদের কালীঘাটের পটে শেডিং [এবং সাদা জমির ওপর আঁকা ছবি] ব্যবহারে বিলেতি জলরঙের ছবির প্রভাব বিষয়ক বক্তব্যের ভ্রান্তি ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভালোভাবে

বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।[৩] ভোলানাথ ভট্টাচার্য কালীঘাটের অঙ্কনশৈলীকে কয়েকটি চিহ্নিত পর্যায়বিভক্ত করেছেন —

১. প্রাথমিক পর্যায়ে ভাবনা দাসের ভুষোকালির বহিঃরেখাসম্বলিত পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্র,
২. দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশী টেম্পেরা পদ্ধতির ঘন জলরঙ (পণ্ডিতবর্গ কথিত পশ্চিমা জলরঙ নয়) আলোছায়ার খেলা দেখানোর চেষ্টাসম্বলিত অমৌলিক বিবিধ বিষয়ক চিত্র,
৩. মোলারামের রেখা-ছন্দ বাঙলা কলমে বৈরাগী কর্তৃক রূপান্তর মূলত নীলমণি, গোপাল ও বলরামের নেতৃত্বে প্রথম পর্যায়ের ভুষোকালির বহিঃরেখা ও চিত্রবস্তুর পুনঃপ্রবর্তন,
৪. ঘন জলরঙে তৎকালীন সামাজিক বিষয়বস্তু, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পশ্চিমা লিখনশৈলীর অনুকরণে বাজার পট লিখন। এই পর্যায়ে নেতৃত্বস্থানীয় হলেন কালী, নিবারণ, বটা প্রভৃতি,
৫. অন্তিম পর্যায়ে পূর্বোক্ত চারটি পর্বের লিখনশৈলী ও চিত্রবস্তুর অনুকরণ, যার নেতৃত্বে ছিলেন রজনী। [ভোলানাথ ভট্টাচার্য, ২০১০ : ৫৩-৫৪]

ভোলানাথ ভট্টাচার্যকৃত পর্যায় অনুসারে চতুর্থ পর্বে বিলেতী জল রঙের ব্যবহার শুরু হয়। এই সময়ে বৃটিশ ন্যাচারাল পেন্টিং-এর প্রিন্টগুলি কলকাতায় খুব পাওয়া যেতো, এই পর্যায়ের কালীঘাট শিল্পীরা সেগুলি দেখে থাকবেন, যার কিছু কিছু উপাদান নিয়ে নিজস্ব শৈলীতে তাঁরা ছবি এঁকেছেন (অনেকটা টেরাকোটা মন্দির শিল্পে কোথাও কোথাও সাহেব মেমদের দেখা যায়, সেইরকম)।

দেব-দেবী-পৌরাণিক আখ্যানের পরে কালীঘাটের শিল্পীরা সামাজিক চিত্র আঁকা শুরু করলেন। যার মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের ছবি — ভিস্তিওয়ালা, মাছবিক্রেতা, এই সব চিত্র চলে এলো। মহরমের দুলদুলের ঘোড়াও দেখা গেল।

প্রাথমিক পর্বে শুধুই দেবদেবী ও পৌরাণিক ছবি থেকে ধীরে ধীরে বিষয় বৈচিত্র্যে কালীঘাটের পট আরো বিচিত্র হয়ে উঠল। এর মধ্যে নগর জীবনের অভিঘাত এসে পড়ল, সাদা কালো রেখাচিত্র থেকে চিত্র রঙিন হয়ে উঠল, প্রাকৃতিক ছবি যোগ হল। কীভাবে প্রাকৃতিক ছবি বা Natural Painting কালীঘাটের ছবিতে এসেছিল তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত — সবুজ তোতা, গলদা চিংড়ী, কই মাছ ও চিংড়ি, মাছ মুখে বেড়াল, লাল তোতা, সাপের মাছ খাওয়া, ময়ূর ও সাপ, মাছ ও চিল, চিংড়ি মাছ ধরা একটি হাত। এগুলির সঙ্গে বাংলার মাটির পুতুলের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। আর চিংড়ি মাছ ধরা একটি হাত ফরাসি শিল্পী Fernand Léger-এর পরবর্তী সোডা বোতল হাতে নেওয়া ছবিটির কথা মনে করিয়ে দেয়।

কালীঘাট তখন কলকাতার সত্তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, আঁকা হচ্ছে বৃটিশ সৈন্য, লক্ষ্মীবাই, বিচারের দৃশ্য, শ্যামাকান্ত রায়ের সঙ্গে লড়াই। নগর জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য, চরিত্র উঠে আসছে — গায়ক, বাদক, বেহালা হাতে সরস্বতী, নারীর কেশচর্চা,

বাবু, বিবি, সেতার হাতে নারী, নায়িকা, আয়না হাতে নারী, খেমটা নাচ, বাবুর হাতে হুঁকা তুলে দেওয়া নারী, পতিতা, কলকাতার বাবু কালচার ও নানান ভণ্ডামী নিয়ে কালীঘাটের শিল্পীদের ছবিগুলি অতুলনীয় — সাহিত্যে যেমন 'নব বাবু বিলাস', 'নব বিবি বিলাস', 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', এবং কলকাতার সামাজিক দলিলও বটে। উনিশ শতকের কলকাতার নববাবুদের জীবনধারা ভোগবিলাসের কথা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে, বইও অনেক লেখা হয়েছে। এই সমাজকে ব্যঙ্গ করা কালীঘাটের শিল্পীদের একটি বিষয় হয়ে দাঁড়াল। বাবু বিবির পা ধরছে, বিবি বাবুকে ভেড়া বানিয়ে নিয়ে যায়, ভণ্ড বৈষ্ণব, এর পর তারকেশ্বরের মোহান্ত-এলোকেশী সংবাদ। মোহান্ত-এলোকেশী নিয়ে কত শত যে ছবি আঁকা হয়েছিল তা সঠিক বলা যাবে না। সব সংগ্রাহকের কাছে ও সংগ্রহশালায় মোহান্ত-এলোকেশী সংবাদ নিয়ে কালীঘাটের ছবির সিরিজ দেখা যায়। মেয়েদের ঝগড়া বা সতীনদের মধ্যে ঝগড়া, মদের গেলাস হাতে রমণী, নানা ধরনের বাবু, মঞ্চের মতো ওপরে সাজানো পর্দা দেওয়া সেখানে নটী, বাইজী, বাবুর সঙ্গে মেমসাহেবদের মতো পোশাক পরা নারী, প্রেম প্রকাশ।

সেই সঙ্গে দেব দেবী পৌরাণিক বিষয়ক, রাম রাবণের যুদ্ধ, জটায়ু, বুক চেরা হনুমান, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ এ ধরনের ছবিও আঁকা হতে থাকল। ইংল্যান্ড, চেকোস্লভাকিয়া, রাশিয়া থেকে পর্যটক ও ধর্মযাজকরা এসে কালীঘাটের পট সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন — একটি ফোলিওতে বহু সংখ্যক পট থাকত যাতে হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে সামাজিক চিত্র থাকত, ১৮৫০ এর পর থেকেই বিদেশে কালীঘাটের পট সংগ্রহ শুরু হয়েছে, পরে আমেরিকায়ও বড় সংগ্রহ গড়ে ওঠে, এখন হাজারেরও বেশি কালীঘাটের পট বিদেশে আছে। রাজস্থান, গুজরাট, দক্ষিণ ভারত থেকেও তীর্থযাত্রীরা এসে কালীঘাটের পট কিনে নিয়ে গেছেন। ইন্দোরে এরকম একটি সংগ্রহ দেখে বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর ব্রাঙ্কুসি মুগ্ধ হন। প্রদোষ দাশগুপ্ত লিখছেন, "তাছাড়া ব্রাঙ্কুসির সংগ্রহে অনেক কালীঘাট পটের ছবি ছিল যার মর্ম উনি রঁদ্যার কাছ থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যাঁর ওপর ব্রাঙ্কুসির অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। আর মুর (হেনরি মুর—লেখক) তো ব্রাঙ্কুসির কাছে বেশ কিছুদিন শিক্ষানবিশী করেছিলেন এবং সেই সূত্রে ভারতীয় ভাস্কর্যের ডৌলের সন্ধান উনি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।" [প্রদোষ দাশগুপ্ত, ১৯৮৬ : ১৫৬] এছাড়া মাতিস, ফারনন্দ লেজে, জাউলেনস্কি চিত্রকলায় কালীঘাটের পটের উপাদান আছে, এমনকি পিকাসোর কোনো কোনো রেখাচিত্র কালীঘাটের রেখাচিত্রকে মনে করিয়ে দেয়। প্রদোষ দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন কলকাতায় এক ভদ্রলোককে বাড়িতে পিকাসোর ও কালীঘাট পটে আঁকা চিংড়িমাছ দেখানো হয়, তিনি দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি পিকাসোর ধরতে পারেননি। চীনা শিল্পী কাও চিয়াং ফু-ও কালীঘাটের শৈলীতে ছবি এঁকেছেন (তথ্যটির জন্য শিল্পী অমিতাভ ভট্টাচার্যের কাছে কৃতজ্ঞ)। এভাবে বিংশ শতাব্দীতে কালীঘাটের পট আন্তর্জাতিক শিল্পজগতে জায়গা করে নিল।

জাত পটুয়ারা পরবর্তীকালে কালীঘাটের শিল্পীগোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন

শিল্পীদের সহকারী হিসেবে, কালীঘাটের পটুয়াদের সাহায্য করতে করতে কালীঘাট শৈলী আয়ত্ত করলেন, এঁরাই 'চিত্রকর' উপাধি নিয়ে কালীঘাট শিল্পীদের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

আনুমানিক ১৭৫০ এ রচিত দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীতেও কালীঘাটে পুজো, হোম এর কথার উল্লেখ আছে — "চলিল দক্ষিণ দেশ। বালি ছাড়া অবশেষ। উপনীত যথা কালীঘাট।। দেখেন অপূর্ব স্থান। পূজা হোম বলিদান। দ্বিজগণে চণ্ডী করে পাঠ।।" বালথাজার সলভিন্স এর 'LES HINDOUS' তে কালীঘাট মন্দিরের ছবি লিথোতে ছাপা আছে, এটি ১৮১০ এ ফ্রান্সে মুদ্রিত, তার আগেই ১৮০৭-৮ এ সলভিন্স ভারত থেকে দেশে ফিরে গেছেন (সলভিন্স কলকাতা ছাড়েন ১৮০৩ এ)। সম্ভবত ১৮০২ থেকে ১৮০৩ এর মধ্যে আঁকা হয়েছে ঐ মন্দিরের ছবি, সেখানে অনেক লোকজনও দেখা যাচ্ছে, ১৮০৯ এ মন্দির প্রতিষ্ঠার আগেই মন্দিরের মূল অংশ ও নাটমন্দির হয়ে গেছে। ১৮০৯ এর আগে থেকেই ঐ মন্দিরে তীর্থযাত্রী আসছেন, বসতি ছিল, শিল্পীসমাজ ছিল। এর কিছুদিন পর থেকেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিল্পী সম্প্রদায় কালীঘাটে আসতে শুরু করেন, জাতিতে এঁরা কেউ সদগোপ, কেউ কুমোর, কেউ সূত্রধর। প্রথম দিককার শিল্পীদের মধ্যে ভাবনা দাস, তাঁর ভাইপো গোপাল দাস, নীলমণি দাস ও বলরাম দাস, পরে নিবারণ ঘোষ ও কালী ঘোষ, বলাই বৈরাগী, পরাণ দাস, খ্যাপা কানাই। এঁদের মধ্যে নিবারণ ঘোষ দির্ঘজীবী ছিলেন। শেষ পর্যায়ের দুই বিশিষ্ট শিল্পী রজনী চিত্রকর (এঁর একটি সংক্ষিপ্ত আত্মকথা 'অন্বিষ্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত) এবং তাঁর পুত্র শশী চিত্রকর। "তীর্থপণ্য পট কালীঘাটে এসে যেন মুক্তিস্নান করল। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে চিত্রোপজীবী এসে এই ঘাটে তরী বাঁধলেন এবং ত্বরিত পেন্সিল রেখার টানে গড়ে তুললেন এক বিশেষ ধারা। দেখতে দেখতে কালীঘাটে চৌকসের একটি জমানো বাজার গড়ে উঠল এবং কাছাকাছির সমস্ত মেলায়ও কালীঘাটের প্রান্তের চৌকস উপস্থিত হতে লাগল। ..... খ্যাপার ছবিতে কাংড়া কলমের অনুকরণ ও পরিবর্তনের কায়দাটুকু লক্ষ করলে বোঝা যায়, দ্রুততা কালীঘাটের ছবিকে বিশিষ্ট করেছে। হতে পারে ব্যবসায়িক কারণে পটুয়া দ্রুত লিখনে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু তা না-হলে আবার কালীঘাট পট ছবির রাজ্যে কোনো নামই হত না।" [ভোলানাথ ভট্টাচার্য, ২০১০ : ৫১]

কলকাতা ও নিকটবর্তী কয়েকটি মেলা যেখানে কালীঘাট শৈলীর পট বিক্রি হোত —

টালিগঞ্জ রাসবাড়ি — রাসের মেলা
পাহাড়পুর (কলকাতা) — পীরের মেলা
কাঁচরাপাড়া (২৪ পরগণা) — ঝুলন মেলা
নবাবগঞ্জ (ইছাপুর, ২৪ পরগণা) — ঝুলন মেলা
মহেশবল্লভ তলা (হাওড়া) — রথের মেলা
রামরাজাতলা (হাওড়া) — রামনবমী [প্রদ্যোৎকুমার ঘোষ, ১৩৭৩ ব]

এর মধ্যে আরেকটি সূত্র দিয়েছেন বনি গুপ্তা ও জয়া চালিহা। তাঁদের মতে চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী মন্দিরে পট শিল্পীরা থাকতেন, বর্গি হাঙ্গামার পর যখন নবাবের প্রতিনিধি চিৎপুর ছেড়ে যান তখন ঐ অঞ্চলে চোর ডাকাতদের অরাজক রাজত্ব শুরু হওয়ায় ঐ শিল্পীরা চিৎপুর ছেড়ে কালীঘাট মন্দিরের কাছে আশ্রয় নিলেন। অবশ্য ঐ শিল্পীদের আঁকা কোনো নমুনা এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি।

হালিশহর থেকে কালীঘাট পর্যন্ত যাতায়াতের একটি রাস্তা ছিল, চিৎপুর ঐ রাস্তার ওপরেই পড়ে, তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে শিল্পীসমাজেরও যাতায়াত থাকতে পারে আর কালীঘাট ও হালিশহর বা কুমারহট্ট দুটিরই ভূস্বামী ছিলেন সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার। হালিশহরে যে সরা ও পট জাতীয় চিত্রের প্রচলন ছিল তা দেখা যায় ঐ অঞ্চলের কুমোরপাড়ার ভোনা পটুয়া অঙ্কিত একটি রামপ্রসাদের চিত্রে (সম্ভবত সরায় আঁকা পরে পটে অনুকৃতি করা, ভোনা পটুয়া রামপ্রসাদকে (১৭২০-৮১) দেখেছিলেন, ছবিটি দীনেশচন্দ্র সেন 'বৃহৎ বঙ্গে' প্রকাশ করেছিলেন)। "কালীঘাট শাখার বহিঃরেখা ও তার লিখন শৈলীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যে-সব শিল্পশৈলীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে তিলে তিলে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার পরিধি ও বৈচিত্র্য রীতিমতো বিস্ময়কর। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই গড়ে ওঠা তিলোত্তমা তত্ত্বে বিন্দুমাত্র সহনশীল না-হয়ে এই শাখা-কলমের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দেশি-বিদেশি কোনো কোনো পণ্ডিত কিছু মূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। কোরাসে গলা মিলিয়ে তাঁরা রায় দিয়েছেন, ধর্ম-নিরপেক্ষ চিত্রবস্তুই প্রমাণ করে কালীঘাট কলম পশ্চিমাস্য। অথচ কালীঘাট কলমের উৎপত্তি ইতিহাস থেকে এ কথা স্পষ্ট নিতান্ত অর্থনৈতিক দায়ে ও কিছুটা বৃহত্তর শিল্প-সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে এই শাখা-কলমের পটুয়ারা একটি মাত্র পর্যায়ে সনাতন ধর্মীয় বিষয়ভাবনার সীমা পেরিয়ে ভিন্ন ভাবনায় মগ্ন হবার প্রবণতা দেখিয়েছেন। বাঙলা কলমের সামগ্রিক বিষয়ভাবনার তৎকালীন রুদ্ধ পরিধির বিচারে এই পথান্বেষণ নাগরিকতা তথা আধুনিকতার যাদুস্পর্শে সংঘটিত হয়েছিল। ওদিকে ইতিহাস বলে ধর্মনিরপেক্ষ চিত্রবস্তু বাঙলা ধারার অতি প্রাচীন, প্রাচীন, মধ্য ও পর-মধ্য যুগে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।" [ভোলানাথ ভট্টাচার্য, ২০১০ : ৫৩]

নব পর্যায়ে সোনা-রূপার কাজে অলঙ্কৃত কিছু মিনিয়েচারধর্মী ছবিও আঁকা হয়েছে — রাজস্থানী কাঙড়া অনুচিত্রের শৈলীতে। ব্যবহার করা হয়েছে গলানো টিন। কালীঘাট পটুয়া পরিবারের মেয়েরা ছবি আঁকতেন না, তাঁরা পুরুষদের ছবি আঁকার কাজে সহযোগিতা করতেন যেমন রঙ গোলা, তুলি তৈরি রাখা। এঁরা পুতুল তৈরি করতেন। আগেই দেখানো হয়েছে নানান জাতির শিল্পীরা কালীঘাট পট আঁকতেন — কুম্ভকার, সূত্রধর, সদগোপ। পরবর্তীকালে একই পটচিত্রের কপি হয়েছে একাধিক যামিনী রায়ের ছবির মতো। শুধু দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ নয়, পূর্ববঙ্গ থেকেও শিল্পীরা এসেছেন। ঢাকার পটুয়াটুলি অঞ্চলের বাসিন্দা গণেশ পালের দুই ছেলে শশধর ও হলধর, কালীঘাটে এসে রজনীকান্ত পটুয়ার কাছে পট আঁকা

শেখেন, কালীঘাটের পট শিল্পের অন্তিম পর্যায় ১৯৩০ সাল পর্যন্ত শশধরের পট আঁকার খবর পাওয়া গেছে শ্রী পরিমল রায়ের কাছে।

পটুয়াদের সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না, বিশেষ করে প্রথম দিকের পটুয়াদের সম্পর্কে। তবে নীলমণি দাস, বলরাম দাস, গোপাল দাস এঁদের নাম জানা যায়। পরবর্তীকালের পটুয়া রজনী চিত্রকর (১৮৯২-১৯৬৬) খুবই সংক্ষিপ্ত একটি জীবনী লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম মেদিনীপুরের আকুবপুর গ্রামে এক কুমোর পরিবারে, "আমরা পুরুষানুক্রমে ছবি আঁকা প্রতিমা নির্মাণ পটচিত্র লেখা প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পূর্বপুরুষের ভিটা আকুবপুর গ্রামে আজ প্রায় দুইশত বৎসর বসবাস করিতেছি" (রজনী চিত্রকর, অন্বিষ্ট -পট সংখ্যা)। এ থেকে দেখা যায় অনেক কুমোর বা মৃৎশিল্পীরা পুরুষানুক্রমে ছবি বা পট আঁকতেন। রজনী চিত্রকর বলরাম ঘোষ, নিবারণ দাস প্রমুখ প্রখ্যাত পটুয়াদের কাছে পট আঁকা শিখেছেন আবার "প্রখ্যাত শিল্পী চিন্ময়ীলাল চিত্রকরের সহকর্মীরূপে বেহালার সাবর্ণ চৌধুরীদের রথে আন্দুল মৌড়ীর জমিদারদের রথে ছবি লিখিয়া প্রশংসা অর্জন" করার কথা বলেছেন। ময়ূরভঞ্জের মণ্ডপ সজ্জা, প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের বাগানবাড়ী 'চিত্রপুরী'র কুঠিতে বহুদিন চিত্রাঙ্কন করা, প্রতিমা নির্মাণ করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ এই শিল্পী শুধুমাত্র পট অঙ্কন করতেন না, আনুষঙ্গিক আরো শিল্পকর্ম করতেন। শুধুমাত্র পট এঁকে এঁদের জীবিকা নির্বাহ হোত না। এর আগেকার কালীঘাটের পটুয়াদের ক্ষেত্রেও এইরকম বিবিধ শিল্পকর্ম তাঁরা করে থাকা সম্ভব।

উনিশ শতকের কলকাতার বাঙালি রসিক সমাজ কালীঘাটের পটের শিল্পমূল্য বুঝতে পারেননি, তাঁদের আগ্রহ ছিল বৃটিশ অ্যাকাডেমিক কাজের ওপর, চিৎপুর প্রিন্ট, ওলিওগ্রাফ, পশ্চিমের নানান চিত্রকলার প্রতি। তখন বাংলা শিল্পধারার প্রতি কোনো বাঙালিই কোনো উল্লেখযোগ্য রচনা লেখেননি, যদিও ঐসময়ে ভারতীয় মার্গশিল্প নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। ১৮৮৮ তে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 'Art Manufacturers of India' গ্রন্থে ৫ লাইনের একটি মন্তব্য করেন। বিংশ শতাব্দীতে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। 'Rupam' পত্রিকায় অজিতকুমার ঘোষের জুন-অক্টোবর ১৯২৬ সংখ্যার প্রবন্ধটি ছিল এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণকারী। শিল্পী মুকুল দে ১৯৩২ এর 'Advance' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখলেন। কালীঘাটের পট শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, একবার তিনি নন্দলাল বসুকে বলেছিলেন, "কালীঘাটের পট কিছু কর তোমরা। নতুন করে করতে হবে। অর্থাৎ আঁকবার বিষয় হবে নতুন, কিন্তু টেকনিক হবে পুরাতন, অর্থাৎ ট্রাডিশানাল। যাতে লোকে ছবি নেয়, লক্ষ রাখবে সেদিকে।" [পঞ্চানন মণ্ডল, ১৩৮৯ বং ৯৮]। পঞ্চানন মণ্ডলের বিবরণ থেকে জানা যায় নন্দলাল সে সময়ে অনেকগুলি পট এঁকেছিলেন বীনপুরে বসে, অনেকদিন পর অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হওয়ায় বলেছিলেন, "ভাবছি এতদিন ছিলে কোথায়? কালীঘাটের পট নতুন করে আঁকার জন্য লিস্ট করেছি, বাঙ্গালা প্রবাদ-প্রবচনের বিষয়গুলো নিয়ে। এই যে লিস্টি।" তখনই নন্দলাল বার করলেন

এক তাড়া ছবি আর অবনীন্দ্রনাথ কিনে নিলেন সে সব ছবি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশ্বভারতী কলাভবন সংগ্রহশালায় যে কটি কালীঘাটের পট আছে সবই নন্দলাল বসুর সংগ্রহ করা। সাম্প্রতিক কালে কালীঘাট শৈলীতে আঁকা নন্দলাল বসুর ছবি দেখা গেল।

গুরুসদয় দত্ত ও যামিনী রায়ও অনেক কালীঘাটের পট সংগ্রহ করেন, কিন্তু কালীঘাটের পটের নাগরিকতার ছোঁয়া যামিনী রায়ের ভাল লাগেনি।

বৃটিশদের মধ্যে কিছু শিল্পরসিক কালীঘাটের পট নিয়ে আগ্রহী ছিলেন (অন্য দলটি একে বৃটিশ ন্যাচারাল পেন্টিং এর অনুসারী বলে এসেছেন)। অজিত ঘোষ লিখছেন, "সম্প্রতি ইংলন্ডে কালীঘাটের পটুয়াদের আঁকা রঙিন পট ও রেখাচিত্র সম্পর্কে কথঞ্চিৎ আগ্রহ উদ্দীপিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ ও ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়ামের উদ্যোগে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হতে দেখা গেছে।" (বিশ্বভারতী পত্রিকা) যুক্তরাজ্যের মিউজিয়মগুলিতে যত সংখ্যক কালীঘাটের পট রয়েছে, তত পট কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে নেই। উনিশ শতকে Egron Lundagren, J. Lockwood Kipling, E.V. Havel এই তিন বিদেশী শিল্পী আর E. Monier Williams এর মতো পণ্ডিত ব্যক্তি কালীঘাট পটের গুণগ্রাহী ও সগ্রাহক ছিলেন, বাংলার সাধারণ মানুষও সংগ্রহ করতেন, কিন্তু ঐ সময়ের কোনো বাঙালি শিল্পী, শিল্পরসিক এ বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন বলে জানা যায় না।

বিশিষ্ট প্রবীন শিল্প সংগ্রাহক শ্রী পরিমল রায় জানাচ্ছেন শেষদিকে কালীঘাট পটের অন্তিম দশার আগে বার্গনার ম্যাথুস নামক একজন বৃটিশ শিল্পী কালীঘাটের চিত্রশিল্পীদের প্রচুর জলরঙ ও তুলি দিয়ে ছবি আঁকিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি ভ্যালেরি বানার্ড অ্যান্ড ম্যাথুস কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁরা চলে যাওয়ার সময় কালীঘাটের পট সহ প্রচুর দেশীয় চিত্র গুদামে পড়েছিল।

কালীঘাটের চিত্রশিল্পীরা প্রথম দিকে পেন্সিল ব্যবহার করেননি। ছাগল বা ভেড়ার লেজের লোমের হাতে বানানো তুলিতেই একটানে ছবিটি শেষ করতেন। দেখা গেছে একই চিত্রের প্রচুর অনুকৃতি যার বহিঃরেখা মূল চিত্রশিল্পী আঁকতেন আর তাঁর সহকারীরা রঙ দিতেন। তখন মহিলারা সরাসরি ছবি আঁকতেন না কিন্তু ছবি আঁকায় সাহায্য করতেন, এখানে জাত পটুয়ারাও রঙ লাগানোর কাজে সাহায্য করতেন। কীভাবে দেশী রঙ তৈরি হোত — "নারকেলের মালায় রাখা হোত রঙ। লাল রঙ তৈরি করা হোত পান, চুন, খয়ের আর সুপুরি বেটে তার রস মেরে, হলুদ রঙ হোত কাঁচা হলুদ আর চুন গুলে। কালো রঙ হোত কুপির ভুসা থেকে। ঘন নীল আর বেগুনি রঙ বানানো হোত পুঁইয়ের বিচির রস মেড়ে। টকটকে গোলাপি রঙ হোত লাল রঙ আর খড়িমাটি গুলে। সব রঙই তৈরি করার পর শুকিয়ে বেলের আঠা দিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হোত। তাহলেই রঙ পাকা হয়ে যেত।" [শ্রীশ চিত্রকর, ১৯৯৮ : ৬১] এ ছাড়া তুঁত, ভূমিজ নানা রঙও ব্যবহার করা হোত।

মুকুল দে Advance পত্রিকায় লিখছেন তাঁর তরুণ বয়সে কালীঘাটের

অলিগলিতে ৩০/৪০টি দোকান দেখেছেন যেখানে কালীঘাটের পট বিক্রি হচ্ছে — এই দোকান-চিত্রশালাগুলিকে দেখে 'New bureaus' আখ্যা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে ১৯৩০ এই সময় গিয়ে আর দোকান-চিত্রশালাগুলিতে ঐ রকম কালীঘাটের পট আর দেখতে পাননি (১৯৩২)।

কালীঘাটের পটের সূচনাকাল ১৭৯০-১৮১০ যাই হোক না তা চূড়ায় উঠেছিল ১৮৩০-১৮৮০ পর্যন্ত। এর পর থেকে সস্তার ওলিওগ্রাফ, লিথো ছবি কালীঘাটের পটের বাজারটি নিয়ে নেয় এবং ১৯৩০ থেকে অবলুপ্তির দিকে চলে যায়। কালীঘাট পট তার ছাপ রেখে গেছে বড়তলার গ্রন্থচিত্রণ, ওল্ড বেঙ্গল শৈলীর তেলরঙ জলরঙ এমনকি ছাপা চবিতে। কালীঘাটের চিত্রশিল্পীদের পরবর্তী প্রজন্ম ধীরে ধীরে অন্য পেশার দিকে চলে গেছেন। এখন ক্ষদু চিত্রকরের পৌত্র ভাস্কর চিত্রকর কালীঘাট শৈলীতে ছবি এঁকে চলেছেন। কালীঘাট পটের উপাদান পরবর্তী শিল্পীদের কাজে মাঝে মাঝেই উঠে এসেছে। যামিনী রায়, পরিতোষ সেন, নীরদ মজুমদার, যোগেন চৌধুরী, সুহাস রায়, লালুপ্রসাদ সাউ — এঁদের ছবিতে তার ছাপ দেখা যায়।

পরিশিষ্ট

(১) আর্চার (W. G. Archer) আঠারো শতকে বাংলায় মাত্র ৩ রকমের চিত্রকলার কথা বলেছেন — (ক) মুঘল সাম্রাজ্যের সময়ে দিল্লীতে উদ্ভব পরে বেনারস, মুর্শিদাবাদ ও লক্ষ্ণৌতে প্রচলিত চিত্রকলা। (খ) বৃটিশ চিত্রকর পেশাদার ও অপেশাদার চিত্রকর এবং তাঁদের উৎসাহে পাটনা থেকে কলকাতায় চলে আসা মিনিয়েচার শিল্পীরা, যাঁরা বৃটিশদের উৎসাহে 'ন্যাচারাল পেন্টিং' করতেন বা পশ্চিমের চিত্রকলার অনুসারী কাজ করতেন, নানা বিষয় ছবিতে 'ডকুমেন্ট' করতেন। (গ) পটুয়া সম্প্রদায়।

আমরা প্রাক্-কথায় আরো ৭ প্রকারের চিত্রকলা যা আঠারো শতকের বাংলায় প্রচলিত উল্লেখ করেছি তা আর্চারের চোখে পড়েনি। চৌকাপটের বিভিন্ন প্রচলিত প্রকার, যেগুলি তিনি দেখেননি, ফলত কালীঘাট পট সম্পর্কে তাঁর আলোচনা অনেকটাই একপেশে ও অসম্পূর্ণ। তিনি তাঁর আলোচনায় ওপরের তিনটি ধারার ভিত্তিকেই কালীঘাট পটের উৎস মনে করেছেন।

(২) অনেকেই চীনা সাদা কালো চিত্রের সঙ্গে কালীঘাটের সাদৃশ্য দেখেছেন, আসলে কালীঘাটের চিত্র রেখাভিত্তিক আর চীনা চিত্র স্ট্রোকভিত্তিক (সূত্রটি শিল্পী অমিতাভ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন এবং ছবি এঁকে বিশ্লেষণও করেছেন)।

(৩) কালীঘাটের চিত্রে শেডিং আছে তা করা হয় ডৌলতা বা 'রিলিফ' দেখানোর জন্য, আলোছায়ার জন্য নয়। বৃটিশ ন্যাচারাল পেন্টিং এর প্রভাব দেখাতে গিয়ে কেউ কেউ লিখেছেন পটভূমি বা Background সাদাটা ঐ প্রভাবপ্রসূত। ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন কত আগে থেকেই পুথিচিত্রে ঐ সাদা Blank Background ছিল, যেমন সাতের শতকের 'মহাভাগবতপুরাণ',

১৮ শতকের 'রামচরিতমানস'। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত 'পদ্মপুরাণ'এর চিত্রিত পুথি এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংরক্ষিত 'গীতগোবিন্দ'এর পুথিতেও Blank Background দেখেছি।

(৪) বাংলায় সব রকমের চিত্রশিল্পীদেরই পটুয়া বলা হোত, কিন্তু পটুয়াদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। পটুয়া বলে একটি জাতি বা সম্প্রদায় আছে যারা কুম্ভকার বা সূত্রধর বা সদগোপ সম্প্রদায়ের থেকে আলাদা শিল্পীগোষ্ঠী। এই জাত পটুয়ারা ধর্মে মুসলমান কিন্তু পৌরাণিক দেবদেবী আঁকেন, আচার আচরণও মিশ্র। এই পটুয়া জাতির বাংলায় দীর্ঘকালের পট আঁকার ঐতিহ্য আছে, গান গেয়ে একটি লম্বা গোটানো কাপড়ের ওপর আঁটানো কাগজে অনেকগুলি ফ্রেমে এক একটি পৌরাণিক বা মহাপুরুষদের আখ্যান এঁরা গান গেয়ে দেখিয়ে থাকেন। কালীঘাটের পট এই সম্প্রদায়ের শিল্পীরা শুরু করেননি, পরে এসেছেন। এই দুই শিল্পী সম্প্রদায়ের শিল্পশৈলীর পার্থক্য পরিষ্কারভাবেই দেখা যায় —

(ক) জাত পটুয়াদের পট দীর্ঘ, কালীঘাটের পট দীর্ঘ নয় তাতে একটির পর একটি দৃশ্য এঁকে আখ্যানের বর্ণনাও করা হয় না।

(খ) পটগান পটুয়াদের পটের একটি অঙ্গ অর্থাৎ গান গেয়ে পট দেখাতে হবে, কালীঘাটের পটে তার প্রয়োজন হয় না।

(গ) কালীঘাটের পটে দ্বিমাত্রিক রেখার টানে শুধু চিত্রটিকে আঁকা হয়, পটুয়া পটে নানান প্রাকৃতিক দৃশ্য দিয়ে রঙ দিয়ে Background ভরিয়ে তোলা হয়।

(ঘ) কালীঘাটের পটে রঙের ব্যবহার সীমিত, পটুয়াদের পটে বহুবর্ণের প্রয়োগ।

(ঙ) "কালীঘাটের পটে বর্তুলাকার দ্বিমাত্রিক রেখার টান পটটিকে জীবন্ত করে। দীঘল পটে এই রেখার টান আছে কিন্তু বিভিন্ন রঙের বিন্যাসে ভিন্ন ব্যঞ্জনায় সে এক ভিন্ন বস্তু।" (কৃতজ্ঞতা : চিত্তরঞ্জন মাইতি)

(চ) কালীঘাটের পটে বর্ণ ও আয়তন চওড়া করা হয় প্রতিমা তৈরির মোটা তুলি দিয়ে, আলতাটুলি বা তুলো দিয়েও ছবি আঁকা হোত। শেষ পর্যায়ে বিলাতি তুলিরও ব্যবহার হয়েছে।

(ছ) কালীঘাটের পট প্রচলিত হওয়ার ঠিক পরেই উত্তর কলকাতায় চালু হল ধাতু খোদাই, কাঠ খোদাই, গ্রন্থচিত্রণ যেখানে বাঙালি মানসের আর এক উৎকৃষ্ট সৃষ্টির সূচনা দেখা যায়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

(১) কালীঘাটের পট আঁকা কুমোর ও স্থানীয় শিল্পীরা শুরু করেন এ তথ্য প্রতাপাদিত্য পালের (Kali, Calcutta and Kalighat Pictures, "Marg" Vol XLI, No-4, Page- )। কালীঘাট অঞ্চলে ষোড়শ শতক থেকে জনবসতি গড়ে উঠেছিল তা কালীঘাট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গবেষক সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

'কালীক্ষেত্র দীপিকা' গ্রন্থে আছে (হরিপদ ভৌমিক সম্পাদিত, ২০০৮ শশধর প্রকাশনী সংস্করণ — বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ তে)। খড়গপুর আই. আই. টি.র অধ্যাপক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন ঔরঙজেবের আমলের একটি মানচিত্রে কালীঘাট মন্দিরের অবস্থান দেওয়া আছে যা বর্তমান মন্দিরের কাছেই। সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার ১৭৫২ তে কালীঘাটে আসেন, তখন সেখানে কুমোর সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের নথিতে এর উল্লেখ আছে জানাচ্ছেন স্থপতি-লেখক অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং কালীঘাট পট কুমোর ও স্থানীয় শিল্পীসমাজের সৃষ্টি এ মতবাদটি গ্রহণযোগ্য। যামিনী রায় কালীঘাটের পটের উৎস সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন তবে বাইরে থেকে পট আঁকা শুরু করল এ তথ্যটির সঙ্গে আমরা একমত নই। কালীঘাট পট বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে। বাংলাভাষায় এ বিষয়ে কোনো বই-এর সন্ধান পাইনি, সবচেয়ে বড় আকারের গ্রন্থ জ্যোতীন্দ্র জৈন-এর ইংরেজি ভাষায় লিখিত। শিল্পকলা শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতেও এ বিষয়ে চর্চা সামান্যই যদিও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এ বিষয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

(২) কালীঘাটের চিত্রকলা ও দীঘলপটের পটুয়াদের অঙ্কনশৈলী, চিত্রবিন্যাস ও সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যটির মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন চিত্তরঞ্জন মাইতি, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, 'কালীঘাটের পট', লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ২১ বর্ষ, সংখ্যা ৮১। নিবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (ক) "The Kalihgata (Kalighat) Style — The Theory of British Influence", Indian Museum Bulletin, Vol XIX, 1984, Kolkata (খ) "Two Dated Documents of Painting and Kalighat Style", Diamond Jubilee Vol, Victoria Memorial, 1984, Kolkata

**গ্রন্থপঞ্জী :**


পঞ্চানন মণ্ডল, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল, 'দেশ' বিনোদন সংখ্যা, কলকাতা

প্রদোষ দাশগুপ্ত, ১৯৮৬ : স্মৃতিকথা শিল্পকথা, প্রতিক্ষণ, কলকাতা

প্রদ্যোৎ ঘোষ, 1373 BS : Kalighat Pots : Annals and Appraisals, Silpangan Art Society, Kolkata

ভোলানাথ ভট্টাচার্য, ২০১০ : শিল্পভাবনা, মনফকিরা, কলকাতা

যামিনী রায়, ১৪১৫ ব, পটুয়া শিল্প, 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা', ২১ বর্ষ, ৮১ সংখ্যা, কলকাতা

শ্রীশ চিত্রকর, ১৯৯৮ : জয়ন্ত দাসের সাক্ষাৎকার, দেশ, ৮ অগাস্ট



[কৃতজ্ঞতা : ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ভোলানাথ ভট্টাচার্য ও পরিমল রায়, ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, লণ্ডন — আলোচনায় নানান তথ্যের জন্য]